Orientum-Occidentum
© Bejoy Narayan Mahavidyalaya
url: https://bnmv.ac.in/college_journal.php

Vol. 1 No. 1, 51-61 (2022)

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-চিন্তন

সুজিত রেজ
বাংলা বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ – ৭১২১৪৭, ভারত
Email: skrej17@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract)

যে-কোনো চিন্তন-দর্শন-ভাবনা-অনুভাবনার গূঢ় স্বরূপ বিচার করে, তার গৃহীত-সৃজিত অনুষঙ্গের পাঠ-পাঠান্তরের নির্যাসজাত মৌলিকত্ব-স্বাতন্ত্র্য মূল্যায়ণ কূটভিষার নামান্তর ; একইসঙ্গে চাপান উতোরের অবকাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রভূমি কর্ষণের অবকাশ সৃষ্টি করা। এই মায়ালোকে প্রবেশ বাঞ্ছা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ-সিঞ্চিত রসসুধা পানে আগ্রহের উজ্জীবন আমার ধারণ-ক্ষমতা-বিচার।

কথামুখ

শোনো বিশ্বজন
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁকে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুকে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।

এই বিচার একান্তই আমি-সংশ্লিষ্ট। আমার মধ্যে যে আমি আছে, তাকে আহত করার ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে। আহত আমির যন্ত্রণার শুশ্রূষা-প্রার্থনা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। আমার আমি কি ব্রহ্ম? জানি না। কেন জানি না, তা জানি না। বলতে পারব না। জানতে চাইনি তা তো নয়। তবে যেভাবে চাইলে জানা যায় , হয়ত সেভাবে জানতে চাইনি কোনদিন। জানার ইচ্ছের মধ্যেই বড় ফাঁকি ছিল। তবে জানা- অজানার মধ্যে 'কেটেছে' একেলা বহুদিন। 'বিরহের বেলা' হয়েছে দীর্ঘ।

অভিধানে আত্মাদিবিষয়ক কিংবা দেহাদিতে অধিকৃত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অধ্যাত্ম অর্থবাচক।আত্মা "আত্মানং রথিনং বিধি" (কঠোপনিষৎ), অর্থাৎ যা ব্যাপ্ত করে বা সঞ্চরণ করে। আত্মা আপনি, নিজস্বরূপ, স্বীয়রূপ। আত্মা আবার প্রযত্ন, চেষ্টা, ধৃতি, ধৈর্য, ধর্ম, বুদ্ধি, মতি, প্রজ্ঞা, স্বভাব, প্রকৃতি ও শূন্য। আত্মা পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও চৈতন্য নির্দেশক। ব্রহ্ম " বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং "; ওঙ্কার-শব্দ-ধন-বিত্ত-মোক্ষ-অন্ন -সত্য কিংবা তত্ত্বজ্ঞান-আত্মজ্ঞান-প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান। উল্লিখিত ওঙ্কার-শব্দাদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শৈশব-নাড়ির অচ্ছেদ্য বন্ধন। মাতৃজঠরের নাড়িছেদনের অনুষ্ঠানেই মাঙ্গলিক হুলাহুলির পরিবর্তে ধ্বনিত হয় :

" ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"
(জগতে যাহা কিছু চলমান পরিবর্তনশীল বিকারশীল তাহার সব কিছুই যে এক পরমসত্যের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ বিধৃত।)
অথবা " ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবির্তুব রেণ্যং ভর্গো দেবস্যঃ ধীমাহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।।"

(যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনা ধারা-----
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।)

জ্ঞান-পরিধির শৈশব-স্মৃতি রচন বাহুল্যদোষেদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ "মানবসত্য"

প্রবন্ধে বাল্যস্মৃতি উদ্ধার করে লিখেছেন :

"আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা , রামমোহন আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্যই ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।.... এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবল মুখস্থভাবে না ; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বছর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ---- এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড।এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করেছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব --- বাহির ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলেছে। এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পারিবারিক গভীরতার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মলোকে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা নিবিড়তর হয়। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনের জন্য নির্স্বার্থ-প্রাণ পিতা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৭-তে 'মহর্ষি' রূপে কেশবচন্দ্র সেনের কাছে অভিনন্দিত হন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছয়। 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মধর্মবীজ' প্রবন্ধগ্রন্থ প্রণেতা ব্রাহ্মমুখ্য দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভাঙনে ব্যথিত হয়ে, ১৮৮০ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হন। ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন ও দীর্ঘ ২৭ বছর এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

পিতার মনোবাঞ্ছায় ব্রহ্মসংগীত রচনার মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগের সূত্রপাত। ১৮৭৩ সালে পিতার সঙ্গে অমৃতসর স্বর্ণমন্দির দর্শন করে বিস্মিত বালক গুরু নানকের একটি গানের (গগন মে থাল রবি চান্দ দীপক বনে) কথা ও সুরের বিনির্মাণে রচনা করেন প্রথম ব্রহ্মসংগীত : "গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে"। দেশ রাগে ঝাঁপতাল তালের এই গানটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয়। গানের সূত্র-ভিত্তি এতটাই দৃঢ় যে গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের

৬২৬ টি গানের মধ্যে ৪৮৪ টি ব্রহ্মসংগীত ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থের সর্বশেষ পঞ্চদশ সংস্করণেও (১৯৯৩) যা অন্তর্ভুক্ত।

"শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন বা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন" এই উদ্দেশ্য নিয়েই মহর্ষি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে উপাসনা মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপনিষদ ভাষণ পাঠ করেন। এটি তাঁর প্রথম ধর্মদেশনা। পরের বছরে পাঠ করেন ব্রহ্মমন্ত্র। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'সাত বৎসরের ধর্মোপদেশের সংগ্রহ ' ধর্ম পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'নিত্যপূজার নৈবেদ্য' 'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে উপনিষদের মন্ত্রগুলির সহজ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি, যুক্তি ও প্রাচীন ঋষিদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য উপস্থাপিত। যার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রমণের প্রতিজ্ঞা এবং প্রথাসর্বস্ব সনাতন ধর্মের বিচ্যুতি-বেদনা বিনত মানসিকতায় উৎকীর্ণ। 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে তার স্পষ্ট পরিচয় আছে : *"বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দু সমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু সমাজেরই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ, কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে , ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন, তিনি জানেন তাহা হিন্দু সমাজেরই পরিণাম।"*

শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্র-অন্তরে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক আকুতি স্বতঃস্ফূর্ততায় বিকাশ লাভ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক- সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক মিলনগ্রন্থিতে মানবিক-ঐশিক এষণা প্রগাঢ়তমমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। যা সত্য, শাশ্বত ও সুন্দর, যা বৃহৎ, বিপুল ও অবিনশ্বর তারই আস্পৃহায় রবীন্দ্র-অন্তর আকুলিত ও উদ্বেলিত হয়। ধর্ম-সাধনার বিকৃত বিক্ষুব্ধ ক্ষুদ্রতা- সংকীর্ণতা পরিহার করে ভূমার সঙ্গে যোগসূত্র রচনার তীব্র আকুলতা জাগে। এর প্রাথমিক পাঠ তিনি গ্রহণ করেন বেদ ও উপনিষদের মণিকোঠার নিরুপম ও নান্দনিক শ্লোকমালায়। গভীর নিষ্ঠায় চলে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাবগত ও মর্মগত রসসন্ধান। অচিরেই আত্মস্থ হয় :

ক) একঃ দেব সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বভূতান্তরাত্মা...

খ) সর্বে সুখেনি সন্তু সর্বে সন্তু নিরামায়া।

গ) সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেয়াম।

ঘ) স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্তা তস্য লোকাঃ স উ লোক এব...

ঙ) আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

চ) ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু।

ছ) আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।

জ) ভ্রাতারো মানবাঃ সর্ব্ব স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম।

ঞ) বিশ্বানি দেব সবিতদূরিতানি পরাসুব।

বৈদিকোত্তর ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, অহিংস প্রেমের প্রবর্তক, অপরিমেয় করুণা ও মৈত্রী বোধের প্রতিভূ বুদ্ধদেবের "সর্ব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু অবেরা হোন্তু অব্যাপজ্ঝা হোন্তু সুখী অত্তানং পরিহরন্তু" বাণীমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ও প্রশান্তির জগৎ খুঁজে পেয়েছিলেন। নোবেল প্রাপ্তির পর বিশ্ব-পরিক্রমায় আর এক মানবপুত্র যিশুর পায়ের চিহ্নে দীন মানুষের মিলনসাধনপীঠ অবলোকন করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের মানবতাবাদী কবি-শিল্পী-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের স্নিগ্ধ সন্নিধানে, ব্রহ্ম-মানুষ-প্রকৃতি এই উপাদানত্রয়ে "বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে" এই সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হয়েছিলেন।

দীর্ঘজীবনের প্রতিদিবসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর 'হইয়া উঠিয়াছেন'। শেষ জীবনে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি সেকথা জানিয়েছেন - "*আমার জীবন তাহার ধর্মকে লাভ করিয়াছে একটা বাড়িয়া উঠিবার প্রবাহের ভিতর দিয়া, কোনো উত্তরাধিকারের ভিতর দিয়া নয়, বাহির হইতে আমদানির দ্বারাও নয়।.... সব কিছুর ভিতর দিয়াই যে একই বিষয়বস্তু প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই আমার নিকট প্রমাণিত হইয়াছে যে 'মানুষের ধর্ম' আমার মনের মধ্যে একটা ধর্মের অনুভূতিরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনো দার্শনিক বিষয়বস্তুরূপে গড়িয়া ওঠে নাই।*" আত্মলব্ধ এই মানসিক শক্তিতেই ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ অহং-এর আবরণ মুক্ত করেছেন। এই অহং নিত্যকালের অহং নয়, তা তো শাশ্বত অমৃতরূপ। এই অহং ক্ষুদ্র; প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা ও ভেদবুদ্ধির দ্বারা আবৃত, ক্লিন্ন ও মলিন। ভেদাত্মক আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই জন্মায় পাপ। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে এই সংকোচনধর্মী অহং-এর খোলস পরিত্যাগ অনিবার্য। কেননা "*আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটী বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।*" (আত্মার প্রকাশ, শান্তিনিকেতন)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্ম নিরূপণমূলক উক্তি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা লব্ধ সমর্থন পেয়েছে - "*যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, যিনি এই সখল পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি বাকরহিত উদাসীন - তিনিই আমার আত্মা, তিনিই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে - এই-ই ব্রহ্ম।*" বিশ্বপ্রবাহ এক এবং অখণ্ড। এককে জানাই মানুষের লক্ষ্য। এককে জানলেই সমস্ত কিছুই জানা যায়। সব কিছুই করায়ত্ত হয়। সেখানেই মানুষের অমৃতত্ব অমরত্ব। বিশ্বপ্রবাহ একটি অনাদি অনন্ত মহাসঙ্গীত -

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজবে হিয়ামাঝে।(১৫)

তুমি কেমন করে গান করো যে, গুণী
অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।(২২)

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে
সেই প্রাণসমন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।(৭৪)

রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম মোহ নয়, মোহ থেকে মুক্তি। নিজের গোষ্ঠীর ধর্মমতকেও তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। দেবালয়ের তথাকথিত পবিত্র আবেষ্টনে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর অস্তিত্ব অনুসন্ধান অর্থহীন-

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহাকে তুই খুঁজিস সংগোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নেই ঘরে।

'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের পর, রঘুপতি গোমতীর জলে ত্রিপুরেশ্বরী কালিকামূর্তি নিক্ষেপ করেছে। রানি গুণবতী স্বামী গোবিন্দমাণিক্যের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, মাতৃ-আরাধনার জন্য মন্দিরে উপস্থিত হয়ে লক্ষ করেছে, দেবীমূর্তি নেই। বিস্ময় -কৌতূহলে তিনি রাজপুরোহিতকে প্রশ্ন করেছেন : দেবী কই?

রঘুপতি : দেবী নাই।
গুণবতী : ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষশান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মা'র পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু, আজি এই
এক রাত্রি তরে। কোথা দেবী?
রঘুপতি : কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
ছিল না কখনও।
তাই--- কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়
(গীতিমাল্য/৮১)

কল্পিত, আরোপিত কঠোর নিয়ম-অনুশাসনের নিগড়ে দেবতা সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। "এইজন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খ্রিস্টানের হাত থেকে খ্রিস্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্য বিশেষভাবে সাধনা করতে হয়।"(খ্রিস্ট/খ্রিস্টধর্ম)

আপন সত্তার অসাড়তার নির্মোক উন্মোচনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক-মানস বরণ করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল আন্তর-আনন্দের জগতে বিহার। একমাত্র নিজের পূর্ণ প্রকাশেই সেই আনন্দ পাওয়া যায়, তা-ও উপলব্ধি করেছিলেন। এবং "আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর" মনে করেছিলেন। তাই অন্তরতরর কাছে অন্তর বিকশিত করার, জাগ্রত-উদ্যত-নির্ভয়-মঙ্গল করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম - কর্ম একই পেটিকায় গ্রন্থিবদ্ধ : "আমার ধর্ম হইল একজন কবির ধর্ম - এ ধর্ম কোনও নিষ্ঠাবান সদাচারী লোকের ধর্মও নয়, কোনও ধর্মতত্ত্ববিশারদের ধর্মও নয়। আমার গানগুলির প্রেরণা যে অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই পথেই আমি আমার ধর্মের সকল স্পর্শ লাভ করিয়াছি। আমার কবিজীবন যে রহস্যময় ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে, আমার ধর্মজীবনও ঠিক সেই একধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত যেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে......." (হিবার্ট লেকচারস্)

সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মধ্যেই অধ্যাত্মসুধার নিরন্তর ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে।

একি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,

সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই----
কোথা ভেসে যাই দূরে !

উপসংহার

কবি ঋষিতুল্য, মেধাবী, ক্রান্তদর্শী, মনীষী,প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্বুদ সুর একমাত্র কবির কানেই অনুরণিত হয়। কবিত্বশক্তি তূরীয়, দিব্য, অতিলৌকিক, ঐশ্বরিক, অনিঃশেষ, ইহজন্মীয় ও জন্মান্তরীয়। কবির সৃষ্টি তাই হৃদ্য, সুন্দর, রমণীয়, বিচিত্র, মনোরম, অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুত বিস্ময়কর। " মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনার পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।" সৃষ্টি করে আনন্দে। সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই আনন্দ। "আকাশ খানিকদূর পর্যন্ত আকাশ, ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে হে নীল।" সেই নীলিমাতেই আনন্দের বিস্তার। রবীন্দ্রনাথের চিত্তই সেই আকাশ। যে আকাশ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের ইচ্ছা দিয়ে পূর্ণ। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া - একই কথা। "ঝরনার একপ্রান্তে কেবলই পাওয়া, অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে - কেবলই পাওয়া। আর এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া - অতলস্পর্শী সমুদ্রের দিকে।" এই অন্তহীন পাওয়া আর দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তনেই আনন্দের উৎসার :

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগবিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে-তালে-লয়ে
নাচিছে ভুবনে ; সেই প্রাণ চুপেচুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে---- বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্রদোলায়

দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ারভাঁটায়।

কবি ও গুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই মহাকালের বাণী ও মহাবিশ্বের রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বেদ ও উপনিষদের সূক্ত ও সংগীত এই ঋষিকণ্ঠকে আধার করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কবীর-নানক-মীরাবাঈ-চৈতন্যের ভক্তিসাধনার সহজ উপাচার 'গীতাঞ্জলি'র ভাবতন্ময়তায় সংগতি লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গনে বিশ্বমানবের মহামিলন রচিত হয়েছে। ভগবান ও বিশ্ব একীভূত হয়ে মানুষের ধর্ম হয়ে উঠেছে---

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে
নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

তথ্যসূত্র

ক) সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*
খ) দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*
গ) রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনুদিত *ঋগ্বেদ-সংহিতা*
ঘ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবিজীবনী*
ঙ) প্রশান্তকুমার পাল, *রবীন্দ্র জীবনী*
চ) শঙ্খ ঘোষ, *এ আমির আবরণ*
ছ) ভবতোষ দত্ত, *রবীন্দ্র চিন্তাচর্চা*
জ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্বভারতী